মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির মুখপত্র ● Mouthpiece of Murshidabad Heritage & Cultural Development Society

দ্বি-মাসিক ৪ পাতা ২ য় বর্ষ - ২ সংখ্যা ❑ ৩০ আষাঢ়, বুধবার, ১৪২৭ সন ❑ ১৫ জুলাই, ২০২০ মূল্য - ৫ টাকা

উদ্ধার করা হোক হীরাঝিল

বা মনসুরগঞ্জ প্যালেসের অজানা ইতিহাস

স্বপন কুমার ভট্টাচার্য : ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে ছিল হিরাঝিল বা মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ - যা আজ ভাগীরথীর গর্ভে তলিয়ে গেলেও এখনও থেকে গেছে কিছু ভগ্নাবশেষ। হিরাঝিল আজ

এক ইতিহাস। নবাব আলীবর্দির অতি প্রিয় সিরাজের আবদার রাখতে গিয়ে তৈরী হয় হীরাঝিল প্রাসাদ। কেন না নওজিস মহম্মদ খাঁ দ্বার নির্মিত মতিঝিলের রূপ সৌন্দর্য্য সিরাজ ঈর্ষাকাতর হয়েই এই হীরাঝিল প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন।

১৭৫০ সালে যুবরাজ সিরাজ এই হীরাঝিল বা মনসুরগঞ্জ প্যালেস তৈরী করেছিলেন। ২৯শে জুন এখানেই লর্ড ক্লাইভ মিরজাফরকে হাত ধরে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। সিরাজ তার প্রণয়ী ফৈজীবাঈকে এই প্রাসাদেই দেওয়ালের মধ্যে ইট দিয়ে গেঁথে হত্যা করেছিলেন। হীরাঝিলের সিরাজের ধনভাণ্ডারের খোঁজ পেয়ে সিরাজের পালিয়ে যাবার পর ক্লাইভ, কাশিবাজার কুঠির অধ্যক্ষ ওয়ার্টস, লেসিংটন, মেজর ওয়ালস, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ বিপুল ধনরত্ন নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে রামচাঁদ আন্দুল ও নবকৃষ্ণ শোভাবাজার রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই প্রাসাদ দেখানোর নাম করে দাদু আলীবর্দিকে বন্দী করে মুক্তিপণ দাবী করেছিলেন। সিরাজ এখানে ঝিলে তরণী ভাসিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ফূর্তি করতেন। সুন্দরী নর্তকীদের সুমধুর সঙ্গীতে আকাশ মুখরিত হয়ে উঠতো।

ভাগ্যের পরিহাসে সেই হীরাঝিল ভাগীরথীর গ্রাসানলে হারিয়ে গেলেও থেকে গেছে নক্সা খচিত ভীতের অংশ। সেই সময়কার পোড়ামাটির তৈরী জল নিকাশীর কিছু চিহ্ন। এই জায়গার উপর বাঁশঝাড়,

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

কাশিমবাজারের এক অখ্যাত বণিকের গল্প

ফারুক আব্দুল্লাহ

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি। মুকসুদাবাদের কাশিমবাজার তখন হিন্দুস্থানের নাম করা বন্দর শহর। সপ্তগ্রাম বন্দরের অবলুপ্তির পর কাশিমবাজার বন্দরই নাকি একমাত্র তার

সমতুল ছিল। দেশ বিদেশের বড় বড় ব্যবসায়িরা স্বপ্ন দেখতেন এই বন্দরকে ঘিরে, তারা জানতেন এই কাশিমবাজার বন্দরের হাত ধরেই পৌছানো যাবে বিশ্বের নানান প্রান্তে। ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই কাশিমবাজার রেশম, সুতি, মসলিন প্রভৃতি বস্ত্রের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। দেশ বিদেশ থেকে বহু বণিকরা কাশিমবাজরে প্রবেশ করতে থাকে। বাণিজ্যের মাধ্যমে মুনাফা লুটতে।

একরাম মহম্মদ আইনউদ্দীনও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কাশিমবাজারের তৎকালীন রমরমা কাপড় ব্যবসায় যুক্ত হতে তিনি সুদুর সিন্ধু প্রদেশ থেকে এই বন্দর শহরে এসেছিলেন খুব সম্ভাবত সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তিনি একজন সফল বণিক ছিলেন বলেই অনুমান হয়। ব্যবসা করতে এসে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন কাশিমবাজার শহরেই। পরবর্তীকালে ব্যবসায় জোয়ার এলে তিনি কাশিমবাজারে প্রচুর জমিজমা এবং সম্পত্তি ক্রয় করে বিত্তবান হয়ে উঠেন। সমাজে তার প্রতিপত্তি ও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আঠোরো শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় নবাবী শাসন প্রবর্তিত হলে একরাম মুহাম্মদ নাকি নবাবের দরবারে উচ্চ পদ লাভ করেছিলেন বলে কথিত

এরপর ৩ পৃষ্ঠায় ▶

শের আফগান -এর সমাধি

সোমা চ্যাটার্জী

জন্মসূত্রে আমার বাড়ি বর্ধমানে। কিন্তু এখন আমি দমদম নিবাসী। আজ আমি আমাদের বর্ধমানের ইতিহাস প্রসিদ্ধ এক জায়গার কাহিনী লিখতে বসেছি। যা অনেকেরই অজানা; কারণ সেইভাবে কোনদিন প্রচারে আসেনি। সারা জীবন অবহেলিত হয়েই রয়ে গেছে। জায়গাটি হল শের আফগানের সমাধি। যার বেগম ছিলে মেহেরুন্নিসা ওরফে নূরজাহান। নূরজাহানের নামটা শুনে অবাক লাগারই কথা। বর্ধমানের কার্জন গেট -এর নাম সবাই জানেন। লড কার্জন এই গেট তৈরি করেছিলেন। সেই কার্জন গেট থেকে সোজা রাজবাড়ীর উত্তর ফটক হয়ে আলম ময়ূরমহল পাড়ায় শেষ আফগানের সমাধি। শের আফগান -এর আসল নাম আলি কুলি খাঁ। জন্ম হয়েছিল পারস্য দেশে। শের আফগান শক্ত-সামর্থ্য ও ভালো যোদ্ধা হওয়ায় পারস্য দেশ থেকে এসে মুঘলসেনায় যোগদান করেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সুনজরে থাকার জন্য পদোন্নতি হয়ে লাহোরে চলে যান। সেখানে সম্রাট আকবরের সংস্পর্শে আসেন। খুব তাড়াতাড়ি সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। আকবরের ছেলে সেলিমের বিশ্বস্ত অনুচরের মত ছিলেন। একদিন সেলিমের সাথে শিকারে গিয়ে বাঘের আক্রমণ থেকে সেলিমকে বাঁচান। শের আফগান উপাধি তার এইজন্যই। কারণ

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

সম্পাদকীয়

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানীর হাতে নবাব বাহিনী পরাজিত হয়। এরপর প্রায় ২০০ বছর বাংলা তার স্বাধীনতা হারায়। প্রতি বছর সে জন্য ২৩শে জুন পলাশি দিবস হিসাবে পালিত হয়। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এই কালো দিনের জন্ম দেয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের সেবাদাসদের সাহায্যে নবাব বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বাংলা থেকে কোটি কোটি টাকার অর্থ সম্পদ ইংল্যাণ্ডে পাচার করে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটায়। আর এক সময়ের সোনার বাংলা পরিণত হয় শশ্মানে। পরে ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধ জয়ের পরে ধীরে ধীরে বাংলা পুরোপুরি ব্রিটিশদের অধিকার চলে আসে। প্রতিবছর এই দিনটি বিশেষভাবে পালন করা হলেও করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে এবার দিনটি উদ্‌যাপন করা সম্ভব হয়নি। সব ঠিক হলে আগামী বছর আবার এই বিশষ দিনটি আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করব। অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে পরাজয়ের দিনকে এভাবে স্মরণ করার কি প্রয়োজন! আসলে অনেক সময় পরাজয়কে স্মরণ করার মধ্যেই থাকে ভবিষ্যতের জয়ের বীজমন্ত্র। পরাজয়ের এই কালো অধ্যায়কে স্মরণে রেখেই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভবিষ্যতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লা শুধু নবাব না থেকে হয়ে উঠছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বীর নায়ক, আর তাই ১৭৫৭ -র ২৩শে জুন বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অন্যতম স্মরণীয় দিন। আর তাই প্রতিবছর পরাজয় স্বত্বেও এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

গৌড়-পাণ্ডুয়ার ভ্রমণ ডায়েরী

সহেলী চক্রবর্ত্তী

(গত সংখ্যার পর)

ফিরোজ মিনার থেকে কিছুটা যেতেই চোখে পড়ল এক সুবিশাল প্রাচীরের। যার নাম বাইশ গজী প্রাচীর। একসময় এটি ছিল গৌড় দুর্গের প্রাকার

কিন্তু আজ সামনে কিছু অংশ ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় থাকা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দেয়ালের উচ্চতা বাইশ গজ তাই নাকি এই নাম। তিনকোণা দেয়ালের নীচের দিকে বেশি চওড়া, উপরের দিক অপেক্ষাকৃত কম চওড়া। কথিত আছে একসময় নাকি ঘোড়সওয়ার সৈন্য বল্লম নিয়ে প্রাচীরের ওপর ঘোড়া ছুটিয়ে দুর্গ পাহারা দিত! যদি তা হয় তা যে কি বিস্ময়কর দৃশ্য ছিল ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিল। প্রাচীরের পাশেই আমবাগানে রয়েছে সেন রাজাদের আমলের নিদর্শন বল্লাল বাটী ও জাহাজঘাটা। হয়তো একসময় এখানে বল্লাল সেনের ভবন ছিল। তবে প্রমাণ সেরকম কিছু না থাকলেও ধরে নেওয়া হয় বল্লাল সেনের ভবনটি পরে সুলতান রুকউদ্দিন বরবক শাহ সংস্কার করেন বা পুর্ননির্মাণ করেন। আজ প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপ ছাড়া কিছু পড়ে নেই। কিন্তু অঝোর বৃষ্টির জন্য রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে পরায় আমরা ওখানে যেতেই পারলাম না। বিফল মনোরথ হয়ে পুনরায় গাড়ীতে চেপে বসলাম।

বৃষ্টির মধ্যেই খালবিল, কাঁচাপাকা রাস্তা পার করে এবার এলাম দাখিল দরজায়। এর অর্থ হল প্রবেশ দ্বার। এটি বাংলার সবচেয়ে সুন্দর ও সুদৃঢ় প্রবেশ পথ যা সম্ভবত হোসেন শাহের আমলে নির্মিত। প্রচলিত মত সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ এটি নির্মাণ করেছিলেন কিন্তু শাহী জামে মসজিদ গুণমন্তে মসজিদের প্রবেশ পথই টিকে নেই তখন দাখিল দরজার মতো সুবিশাল সুদৃঢ় তোরণ নির্মাণকারী একটা বড় প্রশ্ন অবশ্যই। এরকম পরিশীলিত নির্মাণ হোসেনশাহী আমলেই সম্ভব। বড় সোনা মসজিদের রাজকীয় নির্মাণের সাথে দাখিল দরজায় নির্মাণের মিলও আছে। তোরণের ভিতরে প্রহরীরা থাকলেও বর্তমানে চামচিকাদের বাস। আমরা তোরণের গলিপথে প্রবেশ করতেই তারা অদ্ভুত আওয়াজে আমাদের আমন্ত্রণ জানালো না তিরস্কার করলো ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে গলিপথে বৃষ্টির মধ্যে ঐ ডাক কিছু গা ছমছম পরিস্থিতি তৈরী করেছিল সন্দেহ নাই। দরজার বিশালত্ব ও টেরাকোটা কাজ মুগ্ধ করে। বেশ কিছুক্ষণ তোরণের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে আমরা রওনা দিলাম গৌড়ের শেষ গন্তব্যের দিকে। *(ক্রমশ)*

রানী ভবানী (১৭২২ - ১৮০২)

জিতুগোপাল চৌধুরী

(গত সংখ্যার পর)

তার বংশের লোকেরা আজও এখানে বসবাস করেন। বড় নগরের মধ্যে যে স্থানে রানী ভবানীর গুরুদেবের বাড়ি সেই স্থানকে মঠ বাড়ি বলে। বড়নগরের আর সৌন্দর্য্য নেই নগরের ধ্বংসাবশেষ তার জলন্ত স্বাক্ষী। এই মঠ বাড়িতে রানী ভবানীর যে মঠ ও ইষ্টক নির্মিত জোড় বাঙ্গালা আছে তার নির্মাণ কৌশল দেখলে মানুষের নির্মিত বলে মনে হয় না। জোড় বাঙ্গালা ইটের তৈরী দেখতে অতি সুন্দর, তার গায়ে ইটের খোদাই করা যা দেব-দেবী, মনুষ্য, পশু - পক্ষী, কীট - পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা-গুল্ম, ভুজঙ্গ অসংখ্য প্রতি মূর্তি, এই বাঙ্গালা মঠে একটিতে শিবলিঙ্গ আর অন্য একটি মঠে দয়াময়ী নারী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবলিঙ্গগুলি বৃহৎ।

বড় নগরের রানী ভবানীর যে বাড়ি ছিল তার অধিকাংশই গঙ্গা গর্ভে। রানী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত ভবানীশ্বর নামে সুন্দর ও সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ একটি প্রকাণ্ড মন্দির মধ্যে স্থাপিত। মন্দিরটি সুন্দর, কত দৈব দুর্ঘটনা, কত অশনি পাত, কত প্রবল ভুমিকম্প গিয়েছে এমনি নির্মাণ কৌশল। এমনি স্থাপত্য বিদ্যার বাহাদুরী যে কোন স্থানে একটু ইটের কনা ও স্থান চ্যুত হয়নি। এর ভিত্তি মূল গঙ্গার তলদেশ হতে গাথনি করা আছে।

১৭৭৩ সালে বাংলা দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। দেশজুড়ে অরাজক, অনেক প্রজা জঙ্গলে গিয়ে ডাকাত হয়েছে, জনশূন্য দেশ তখন তার উপর ইংরেজরা রানী ভবানীর উপর যে পরিমাণ করভার চাপিয়ে ছিল তাতে জমিদারি রক্ষা করতে মুশকিল হয়ে পরে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নাটোর আমিনী কমিশন বসে, তার রিপোর্টে যে সব তথ্য পেশ করা হয় তা থেকে গোটা জমিদারী সঙ্কট উপলব্ধি করে পলাশি যুদ্ধের পরে নাটোর জমিদারীর উপর অস্বাভাবিক কর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এরফলে নাটোর রাজ্যের বহু স্তরে বিন্যস্ত শাসন যন্ত্রের কলকব্জাগুলি অকেজো হয়ে যেতে শুরু করে শত অসুবিধার মধ্যে থেকেও রানী ভবানী দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর,দানধ্যান, পুজাদি চালিয়ে গেছেন। দেব সেবাও দানাদি ক্রিয়াকার্যে ক্রটি ঘটতে দেননি। এ কাজে সহায় ছিল তাঁর বিধবা মেয়ে তারা। বড় নগরে রাণী অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পোড়া মাটির "বাংলা" মন্দির তৈরী করেছিলেন। সে সঙ্গে তাঁর কন্যা তারাও একটি দেবালয় নির্মাণ করে তাতে মনোহর গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের শিলা লিপিতে লেখা আছে খ শূন্য মিত্রশকে শ্রী ভবানী তনু সম্ভবা নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা শ্রী মদগোপাল মন্দির। শূন্য মিত্র ১৭০০ শক, ১৪৭ অর্থাৎ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা জীবিত ছিলেন বোঝা যায়। মা ও মেয়ের পুণ্যব্রত নিয়ে একটি করুণ কাহিনী বারেন্দ্র সমাজে প্রচলিত আছে। আবার মৃত্যু সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে বারেন্দ্র ভুমির সুপ্রসিদ্ধ "ভবানী জাঙ্গাল" নির্মাণ হবার আগে ভবানীপুর পীঠস্থান যেতে যাত্রীরা বড়ো কষ্ট পেত। তীর্থ যাত্রীদের কষ্ট লাঘব করার জন্য ভবানীপুর পর্যন্ত পথ নির্মাণ করতে গিয়ে রানী ভবানী ভদ্রাবতী দেবীর স্বপ্নাদেশ পান — আমার বুকে যে সেতু তৈরী করবে তার বুকে ফুটো হবে এবং অচিরেই মারা যাবে। কিন্তু পথিকদের দুভাগ হওয়ার তারা ঠাকুরাণী শরণাপন্ন হয়। ব্যথিত হয়ে নিজ ব্যয়ে সেতু তৈরীর সঙ্কল্প করেন রানী ভবানী। আপত্তি করেও শেষে বাঁধা দেননি। তিনটি বিরাট খিলানের উপর সেতু তৈরী হয়। সেতু প্রতিষ্ঠার দিন রাত্রে বুকে ব্যথা ও ফুটো দেখা দিল এবং তা শীঘ্রই শতছিদ্রে পরিণত হয়ে মারা গেলেন।

নীলমণি বসাক কৃত ভবানী চরিত্রে দেখা যায়, কন্যা বিধবা হবার পর দান ধ্যান পুজাদি কাজে সদা সুখে থেকেও ভবানী দুহিতার পতি হীনত্ব যন্ত্রণায় সব সময় দুঃখিনী থাকতেন। জীবনে প্রকারান্তরে দুইবার বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে ও তাঁর মধ্যে এক অচল আচার নিষ্ট পরহিত ব্রতী সত্তা ছিল। যা তাঁর ধর্ম এবং সমাজকে ধরে রেখেছে। রানীভবানী যে সকল ব্রাহ্মণ, গঙ্গাতীরবাসী ক্ষেত্রধামবাসী আখড়াধারী, মহান্ত টোল ও অতিথিদের জন্য আর্থিক ভরণ পোষণ করতেন। কোম্পানীর মতিগতি দেখে তাঁর শঙ্কা হল যে উচিত ব্যবস্থা না হলে সে সব বৃত্তি অচিরে ঘুচে যাবে। বাংলা ১১৯৫ (১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) সনে আশি হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদান করে ঐ সব বৃত্তি যাতের চিরস্থায়ী হয় সেই বন্দোবস্ত করলেন। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঐ টাকা তখনো বংশানুক্রমিকভাবে পেতে পারে তাঁর ব্যবস্থা করে গিয়েগিয়েছিলেন। *(শেষ)*

মধ্যযুগের ইতিহাস কথা —
পূর্ববঙ্গের মহাবীর ঈশা খানের স্মৃতি বিজড়িত দুর্গ নগরী স্থান ও সমাধি আজও ইতিহাসের কথা বলে

আমিনুল হক সাদী (বাংলাদেশ)

(গত সংখ্যার পর)

কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলায় রয়েছে এসারসিন্ধুর দুর্গ। এ দুর্গটিতে বাংলার ভুঁইয়াদের প্রধান মসনদ-ই-আলা বীর ঈশা খাঁ'র একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এ স্থানেই মুঘলদের সাথে তিনি অসম সাহসিকতার মাধ্যমে লড়েছিলেন এবং মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহকে পরাজিত করেছিলেন। বর্তমানে দুর্গ প্রাচীর কেটে পরিখাগুলো ভর্তি করে সেখানে জমি ও বাড়ী ঘর তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত দুর্গ এলাকায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রাচীণ ইট পাথরের ভগ্নাংশ। দুর্গের ভেতরে প্রাচীণ জলাশয় রয়েছে। যা স্থানীয়ভাবে বেবুদ রাজার দীঘি বলে পরিচিত। দীঘির পার্শ্বেই বেবুদ রাজার জমিদার বাড়ীর ভগ্নাংশ বিদ্যমান রয়েছে। ঈশা খাঁ'র নগরের পার্শ্বেই গরিবুল্লা শাহ নামক একজন সাধকের মাজারসহ অজানা বহু কবর রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে এগারসিন্দুর দুর্গ এলাকাটি খুবই সুন্দর যা পর্যটনের জন্য অনুকূল পরিবেশ। এই দুর্গটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় সংস্কার ও সংরক্ষণ করতে পারলে সরকারের যেমন রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে তেমনি বিশ্ব ইতিহাসে বাংলার মহাবীর ঈশা খাঁ'র ঐতিহ্যও রক্ষা পাবে বলে মনে করেন স্থানীয় এলাকাবাসী।

৬২ বছরের মধ্যে ৩৬টি বছরই মোঘলদের সাথে অবিরাম যুদ্ধের ফলে জীবনের উচ্ছলতায় ভাটা পড়ে যায় মহাবীর ঈশা খাঁ'র। ফলশ্রুতিতে তাঁর পুত্র মুসা খাকে রাজ্য পরিচালনার জন্য মসনদ-ই-আলা উপাধিতে ভূষিত করেন। মুসা খাঁ বাংলার শাসক (১৫৯৯-১৬১২) সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে মৃত্যু বরণ করলে তাঁকে আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের চত্বরে সমাহিত করা হয়। যা বর্তমানে অযত্ন অবহেলায় অরক্ষিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ঈশা খাঁ কিছুদিনের বিশ্রামের জন্য সোনারগাঁও থেকে মহেশ্বরদী পরগণা বর্তমান গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বক্তারপুর গ্রামের বক্তারপুর দুর্গের প্রাসাদভাটিতে গমন করেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে যান।

(ক্রমশ)

▶ ১ পৃষ্ঠার পর

কাশিমবাজারের এক অখ্যাত বণিকের গল্প

রয়েছে। যদিও তার উত্তরাধিকারীদের কাছে এ বিষয়ে কোন প্রামাণ্য কোন নথি নেই।

বণিক একরাম মুহাম্মদ আইনউদ্দীনের নির্মিত শুধুমাত্র একটি মসজিদই তার স্মৃতি চিহ্ন বহন করে চলেছে। মসজিদটি কয়েকশো বছর ধরে অযত্নে অবহেলায় জরাজীর্ণ হয়ে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে ছিল। অতি সম্প্রতি তার বংশধররা নিজ উদ্যোগে সেই মসজিদটি সংস্কার করে। মসজিদটি কাশিমবাজার ছোট রাজবাড়ির অতি নিকটে অবস্থিত। একরাম মুহাম্মদ আইনউদ্দীনের বংশধরদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল প্রায় ১৭১০ থেকে ১৭১৫ মধ্যে।

তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদের নির্মাণ শৈলীতে চোখে পড়ে মুঘল স্থাপত্যের ছোঁয়া। মসজিদের গম্বুজগুলি আকারে অনেকটাই বড় এবং কারুকার্য খচিত। মসজিদের মূল অংশে প্রবেশ করার আগে রয়েছে একটি বিস্তৃত ঢালায় করা চাতাল। মসজিদকে কেন্দ্র করে রয়েছে একটি বড় বাগান এবং বাগানের ভেতরে রয়েছে একটি সমাধি। সমাধির দেওয়ালে উৎকীর্ণ ফার্সি লিপি অনুযায়ী সমাধিটি, বিবি জান বিবি নামক কোন এক মহিলার যিনি ১৩০১ হিজরী অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৮০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। একরাম মহাম্মদ আইনউদ্দিনের বর্তমান শিক্ষিত নারী। তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে মসজিদের পাশেই সমাধিস্থ করা হয়। বর্তমানে একরাম মুহাম্মদের বংশধররা কাশিমবাজার সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এবং তাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

লোকনাট্য আলকাপের সার্দ্ধ শতবর্ষে সম্রাট ঝাঁকশু

(গত সংখ্যার পর) কুণাল কান্তি দে

আমার শিল্পী জীবনের কথায় উনি লিখেছেন, প্রথম বায়না পাই জঙ্গীপুরে ৮ টাকায়। খাওয়া দাওয়া ফ্রী। জীবনের প্রথম স্বীকৃতি পাই এই জেলার জিয়াগঞ্জের নেহেলিয়ার সুরেন সিংয়ের কাছ থেকে সোনার মেডেল পেয়ে।

ক্রমশঃ ঝাঁকশুর পরিচিতি বিস্তৃত হয়ে পড়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের শুরু হয়। আসরে দাঁড়িয়ে 'ওস্তাদ ঝাঁকসা যা বানায় তাই আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।' বাংলার বাইরে বিহার ভাগলপুর পাটনা, রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা ও নেপাল সীমান্ত বরাবর। রাতের পর রাত লক্ষ লক্ষ দর্শকদের ঘুমন্ত মনটাকে নুতন এক উত্তেজনার জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। আসর থেকে আসরে জীবনের গান ধর্মপ্রীতি সাম্প্রদায়িক ঐক্য মিলনের গান গেয়ে শ্রোতাদের সম্মোহিত করে তোলেন।

বীরভূম ও মালদহ জেলার আলকাপ ওস্তাদ মনকির হোসেন, সুবেদার বিশ্বাস ও নজর বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় ওস্তাদের সম্মান লাভ করেন। সংসারের আর্থিক সমস্যার সমাধান করে বৈজয়ন্তী পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে চলেছেন। তখনকার নবীন কিশোর ছোকরারাও এই দলে অভিনয় করতে পাওয়া স্বপ্নের মত ভাবতেন। আলকাপের ছোকড়াদের জন্য সে সমস্ত কিছু উজাড় করে দিতেন ঝাঁকশু। সে দিনের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে ঝাঁকশুর সমস্ত শিষ্য আজ উজ্বল নক্ষত্র আলকাপের আকাশে। সুধীর দাস, নৈমুদ্দিন, আলতাপ বিশ্বাস, মন্টু বিশ্বাস, আবদুর রাজ্জাক ছাড়াও অনেকে রাজার রাজা, সাক্ষাৎ সূর্য আলকাপের জগতে। একদা ঝাঁকশু যেমন তাঁর অন্যতম ওস্তাদ মনিরুদ্দীনকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন তাঁর বন্দনায় তাঁর সার্থক উত্তর সুরীরাও ওস্তাদের মর্যাদা এতটুকুও ম্লান করেননি। বরংচ আলকাপের আসরে প্রথমেই ঝাঁকশু বন্দনা করে গান করে। তারা যে প্রত্যেকেই একই আকাশের তলে তাদের বন্দনাতেই সে কথার উল্লেখ আছে।

শুনুন শুনুন বন্ধুগণ করি নিবেদন
আলকাপের আন্দোলন করিল যে জন
তাহার চরণে আমি প্রণাম ও জানায়
১৬ জন ছাত্র দেশের মধ্যে রয়।
সুবলকানা, সুবেদালী গোপালচন্দ্র দাস
ফিরোজ আলি, লাল মহম্মদ,
মদন ও প্রকাশ, রবি, মঙ্গল, তারাপদ,
গোপীনাথ দাস, সুশীল কুমার,
লোহারাম আর মন্টু বিশ্বাস
এইভাবে তো আরো কত দেশের মধ্যে আছে
আপন আপন দলে তারা গান করে বেড়াচ্ছে।
পঞ্চরস গান করে ঝাঁকশু গান গায়
মালদহ বীরভুম কত জেলা যায়
গুরুর গুরু ঝাঁকশু যে ভাই বলিয়ে জানাই
আলকাপের আদি অন্ত তার কাছেতে পাই
এখন তবে বন্দনায় হ'ক সমাপন
এবার পালা গানের কিছু কথা করি আয়োজন।

ঝাঁকশুর আন্তরিক নিষ্ঠা ও সাধনায় গ্রাম গঞ্জের মানুষ তো বটেই, শহরের মানুষের কাছেও লোকসংস্কৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 'ময়নামতী', 'কংসবট', 'বলিদান', 'জীবন-মৃত্যু', 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' নামক পালা ও বিষয় বস্তুর অমর শ্রষ্ঠা তিনি। আসরের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রাখতে কখনই তিনি অশ্লীলতার আশ্রয় নেননি, যদিও জবানীতে পাওয়া যায়, আমি আ-কথা, কু-কথা অশাস্ত্রীয়, কিছু গায় না কেননা আলকাপ গান লোকশিক্ষার বাহন।

দীর্ঘ বছরের সাধনায় আলকাপকে জাতে তোলার সব কৃত্তিত্বই ঝাঁকশুর। তবে ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ কষ্ট শান্তি কেন পেয়েছেন তার ব্যাখায় বলেছেন, 'পুরুষকে নারী সাজিয়ে লক্ষ মানুষের মনে যে নেশা ধরিয়েছি এবং নিজেও যে নেশায় মজেছি সে যে, মহাপাপ। এ পাপের শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

তাপ দগ্ধ পৃথিবী যখন ক্লান্ত ১৪ই বৈশাখে (১৩৮৭) এক পড়ন্ত বিকেলে আলকাপ সম্রাট চিরশয্যা গ্রহণ করলেন। অনুরাগী লোকসংস্কৃতি সেবকরা শোকে মুহ্যমান। বিভিন্ন আসরে পাওয়া শ'দুয়েক শাল, ৩০টি সোনার মেডেল, ২২০টি চাঁদির মেডেল কাপ তাঁর কাছে ছিল।

ঝাঁকশুর মৃত্যুতে আলকাপের জগতে ইন্দ্রপতন হ'ল।

★ আলকাপ সংক্রান্ত প্রথম লেখাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার ১৯৮০-র ৩১শে অক্টোবর ১৭ তম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ঝাঁকশুর প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই - লেখক। *(শেষ)*

▶ ১ পৃষ্ঠার পর

হীরাঝিল বা মনসুরগঞ্জ প্যালেসের অজানা ইতিহাস

জমিতে কলার বাগান, চাষ আবাদ চলে। আমাদের দাবী, এই জায়গাটি উদ্ধার করে যদি খনন করা হয়, তহালে ইতিহাস প্রেমীদের কাছে তুলে ধরা যায়,

তাহলে সেই সময়কার অনেক অজানা ইতিহাস ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও পর্যটকদের আকর্ষণ করে তুলবে। হীরাঝিল সংলগ্ন ছিল মোরাদাবাগ। মীরণ যেখানে পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইভদের নিয়ে এসে রেখেছিলেন।আমরা চাই, হীরাঝিল ও তার সংলগ্ন এলাকাগুলো খনন করে সংরক্ষণ করলে মুর্শিদাবাদের নবাবী আমলের অনেক ইতিহাস উন্মোচিত হবে। আমরা মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যাণ্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি সরকার ও জেলা প্রশাসনের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উদ্ধার করা হোক ঐতিহাসিক স্থাপত্য।

বেণীপুরের রাজা বেণীমাধব

(গত সংখ্যার পর) **গোপাল মণ্ডল**

বেণীপুর মোড় থেকে ভেড়াপাড়া টিয়াপাড়া যাওয়ার রাস্তার দক্ষিণ দিকে রাস্তা থেকে কয়েক শো মিটার দূরে একটি প্রাচীন জীর্ণ শিব মন্দির দেখা যায়। তবে এই মন্দির কে তৈরী করেছিলেন তা জানা যায় না। মন্দিরের ভেতরে একটি ছোট শিবলিঙ্গ দেখা যায়। এক বুড়ি ছাগল চরাচ্ছিল। তাঁর কাছ থেকে জানা যায় শিবলিঙ্গটা আসল পাথরের। শিব পুজোতে স্থানীয়রা পুজোটুজো করে। মন্দিরের পাশেই একটি পুকুর বিদ্যমান। এই পুকুরের জল একসময় কাজে লাগত। এক সময় এই শিবমন্দির হয় তো ঘন্টা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে থাকত। মন্দিরের পাশের গ্রামে ঘুরতে গিয়ে দেখা যায় একটি ঘরে পিছনে রাস্তার ধারে বড়ো পাথরের খামের খণ্ডাংশ পড়ে আছে। পাশে একটি ছোট পুকুরের ঘাটেও পাথরের খণ্ডাংশ লক্ষ্য করা যায়। হয় তো এই পাথরের থামগুলি কোনো রাজবাড়ী বা মন্দিরের শোভাবর্ধন করত একসময় এই বেণীপুরেই।

এখান থেকে আর একটু গিয়ে ভেড়াপাড়া-কুসুমখোলা রাস্তার সংযোগ স্থলের আগে রাস্তার উত্তর-পূর্ব দিকে একটি ফাঁকা জায়গা মতো দেখা যায়। বট গাছের বুকে হয়তো একটি মন্দির ছিল। কেননা পুরোনো মন্দিরের ইটের সামান্য গাঁথুনি বট গাছের বুকে জড়িয়ে আছে, উঁকি মারছে। এখানেও দু-তিনটি পাথরের টুকরো দেখা যায়, তাতে দেখা যায় খোদাই করা মূর্তি। এখান থেকে কয়েক পা এগিয়ে গেলে একটি জঙ্গলী কালীর থান দেখা যায়। কোনো মন্দির নাই। গাছের তলায় একটি থান ছাড়া। স্থানীয়রা দাবি করেন খুব পুরোনো এই মায়ের থান। বলি হয়। হাড়িকাঠ তার সাক্ষী।

এই বেণীপুরের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। এ ইতিহাস শৈবযুগের। কেননা কিরীটেশ্বরী - বেণীপুর - কুসুমখোলা - বড়নগর এলাকায় এককালে শিব মন্দিরের প্রাচুর্য ছিল। সে সব মন্দির বেশিরভাগ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সামান্য কিছু টিকে আছে ভাঙাচোরা অবস্থায়, অবহেলা ও অনাদরে। বেণীপুরে বহু ছোট বড় পুকুর দেখা যায়। রাজা বেণীমাধবও কিছু পুকুর কাটিয়ে ছিলেন বেণীপুরে। পরবর্তীতে আরো পুকুর খনন করা হয় এলাকার জলকষ্ট নিবারণে জন্য। সরকারি নথিতে বেণীপুরকে বলা হয় ''শত পুকুরের জননী'' বা 'The mother of hundred ponds'. এত পুকুরের আধিক্য বেণীপুর ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না।

সূত্র —

১. world wide web

২. মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার

৩. লোককথা ও জনশ্রুতি

৪. আদিবাসী জনজাতির জীবন বৃত্তান্ত — ডাঃ বিশ্বনাথ সরকার

যাত্রাপথ — আজিমগঞ্জ থেকে ছোট গাড়ি যোগে বেণীপুর যাওয়া যায়। আবার বহরমপুর-সাগরদীঘি রুটে সাগরদীঘি থেকে বেণীপুর যাওয়া যায়। লালবাগ-ডাহাপাড়া হয়ে বেণীপুর যাওয়া যায়। *(শেষ)*

অবলুপ্তির পথে নবাবী ইতিহাস

যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে মুর্শিদাবাদ শহর। বিশেষ করে নবাবী শাসন ও ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ শাসনের প্রবেশ দুয়ার বলা যেতে পারে। মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে পরবর্তী যেসব নবাবরা এখানে রাজত্ব করেছেন তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা - (১) মুর্শিদকুলি খাঁ (প্রথম নবাব, মুর্শিদাবাদের স্থপতি); (২) নবাব সুজাউদ্দিন; (৩) নবাব সরফরাজ খাঁ (একমাত্র নবাব যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন); (৪) নবাব আলীবর্দি খাঁ (অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল); (৫) নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা (পারিবারিক ও রাজনীতিক ষড়যন্ত্রের শিকার, পলায়ন ও খুন); (৬) নবাব মীরজাফর খান (পলাশী যুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা ও ইংরেজদের সহায়তায় নবাবীপদ লাভ); (৭) নবাব মীরকাশিম (ইংরেজদের কৃপা); (৮) নবাব মীরজাফর খান (ইংরেজদের কৃপায় পুনরায় নবাব); (৯) নবাব নজমউদ্দৌলা; (১০) নবাব সৈফুদ্দৌলা; (১১) নবাব মোবারক-উদ্দৌলা; (১২) নবাব বাবর আলী দেলার জঙ্গ; (১৩) নবাব আলী জা (১৪) নবাব ওয়ালা জাঁ; (১৫) নবাব হুমায়ুন জাঁ; (১৬) নবাব ফেরাদুন জাঁ (১৭) নবাব বাহাদুর হাসান আলী মীর্জা; (১৮) নবাব বাহাদুর স্যার ওয়াসেফ আলী মীর্জা (বাংলার গর্ব); (১৯) নবাব ওয়ারেশ আলী মীর্জা; (২০) সৈয়দ আব্বাস আলী মীর্জা (২০১৪ -র আগস্টে মামলায় জয়লাভ ও নবাবের স্বীকৃতিলাভ)। এতজন নবাব এবং তাঁদের সাক্ষী এই মুর্শিদাবাদ।

এখানে ঐতিহাসিক বিভিন্ন স্থাপত্য রয়েছে। বহু সংখ্যক স্থাপত্য কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। যেমন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার হিরাঝিল প্রাসাদ, মুর্শিদকুলীর চেহেলসেতুন, ঘসেটির সঙ্গ -এ দালান ইত্যাদি। আমরা এই শহরের ঐতিহাসিক স্থাপত্য রক্ষায় ব্যর্থ। মুর্শিদাবাদের একের পর এক স্থাপত্য বে-আইনীভাবে দখল হয়ে গেছে এবং এখনও যাচ্ছে। কিন্তু প্রশাসন নীরব। বেগম মসজিদ দখল হয়েছে। ফুটি মসজিদ দখলের পথে। নবাব সরফরাজ খাঁর সমাধিস্থল দখল হয়েছে। হাজার দুয়ারীর আশপাশের গেটগুলো ও অন্যান্য জায়গাও দখল হয়েছে এবং এখনও দখলদারী চলছে। এগুলোকে বাঁচানোর খুব দরকার। না হলে সৃষ্টি হবে এক কালো অধ্যায়ের। যার জন্য ইতিহাস আমাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না।

▶ ১ পৃষ্ঠার পর

শের আফগান -এর সমাধি

আফগান শব্দের অর্থ হলো কজ্বা করা।

মেহেরুন্নিসাকে বিবাহ করার জন্য পাগল ছিলেন সেলিম। কিন্তু বংশ মর্যাদার কথা ভেবে আকবর তা হতে দেননি। তাই আকবর ১৫৬৪ -তে শের আফগানের সাথে মেহেরুন্নিসার বিবাহ দেন। তাদের একটি কন্যা সন্তান হয়। নাম মিহির-উন-নেসা। এরপর ১৬০৫ -তে আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করে সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু শের আফগান আকবরের পক্ষ ত্যাগ করেননি। ফলে জাহাঙ্গীর শের আফগানকে লাহোর থেকে কুতুবউদ্দিন -এর অধীনে বর্ধমানের জায়গীরদার করে পাঠান। কিছুদিন বাদ শের আফগানের বিরুদ্ধে কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তাই কুতুবউদ্দিনকে আক্রমণ করেন। কুতুবউদ্দিন গুরুতর জখম হন। কুতুবউদ্দিনের অনুচরের হাতে শের আফগান মারা যান। আর কুতুবউদ্দিন ও মারা যান।

শের আফগান -এর মৃত্যুর পর মেহেরুন্নিসাকে পাঠানো হয় দিল্লিতে সম্রাটের কাছে। বছর চারেক পর তার জাহাঙ্গীরের সাথে বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম ক্ষমতাবতী নারী হন। নাম হয় নুরজাহান। নুরজাহানের সাথে বর্ধমানের যে সম্পর্ক রয়েছে তা অনেকেরই অজানা ছিল। এদিকে বর্ধমানের ময়ূর মহলে শের আফগানের সমাধির পাশেই কুতুবুদ্দিনের সমাধি দেয়া হয়। শের আফগান আর তার পাশেই শায়িত তার হন্তারক। এই সমাধি স্থান সারা জীবন অবহেলিত ও অনালোচিত হয়ে রয়ে গেল।

E-mail : sbhattacharyya479@gmail.com

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্য (৯৪৩৪০২১১৫৭), মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক - ফারুক আব্দুল্লাহ (৯৪৩৪৬৪৪০৮৯), সহ-সম্পাদিকা - সহেলী চক্রবর্তী (৮৯৪২৯২৪২৩৪), সম্পাদকমণ্ডলী - অপূর্ব কুমার সেন, অর্ণব রায়।
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ শ্রী পঞ্চানন চক্রবর্তী। অক্ষর বিন্যাস - শুভ্রজ্যোতি তালুকদার (৯৭৩৪৩১৪৫৬৮)। মুদ্রণে - মেসার্স কিস্ অফসেট প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ